অন্নদামঙ্গল : চরিত্র ভাবনা

মঙ্গলকাব্যের চরিত্রভাবনা ও ভারতচন্দ্র

মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত দেবতা-নির্ভর হওয়ায় চরিত্রগুলি সেভাবে 'ইনডিভিডুয়াল' হয়ে উঠতে পারেনি। আসলে মধ্যযুগের পরিবেশে এটা হওয়াও সম্ভব ছিল না। যেখানে দেবতার দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, যেখানে দেবতারাই পুজো পাবার আকাঙ্ক্ষায় মানুষকে এক অনিকেত জীবনের দিকে ঠেলে দেন, চরিত্র তখন আর তার সমগ্র সত্তা নিয়ে বিকশিত হতে পারে না। তবুও এরই মধ্যে আমাদের মনে পড়ে যাবে চাঁদসদাগরের কথা—যিনি একক হয়ে আছেন দৈবীশক্তির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের প্রতীক হয়ে। আরও মনে পড়বে ফুল্লরার কথা—দরিদ্র গৃহবধূর ভূমিকায় ব্যক্তিত্বের নানা কৌণিক মাত্রা যে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। আর অবশ্যই মনে পড়বে মুরারি শীল বা ভাঁড়ু দত্তের কথা—মুকুন্দ যাদের অমর করে রেখেছেন—আজকের চলমান জীবনে যাদের সাক্ষাৎ আমরা মাঝে মাঝেই পেয়ে যাই। এ তো গেল মানুষের কথা। দেবতারাও তো চরিত্র হয়ে উঠেছেন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে—দেবখণ্ডে যাদের দেখা মেলে। দেবতা হলেও মধ্যযুগের কবিরা কিন্তু তাঁদের মধ্যেও মনুষ্যচিত গুণ আরোপ করেছেন। আর সেখানে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁরা কাব্যে চলা-ফেরা করেছেন—আর তাঁদের চলাফেরায়, তাঁদের কার্যকলাপে যুগের ছবিটাও উঠে এসেছে। তাই মঙ্গলকাব্যের চরিত্রালোচনায় দেবতারা বাদ পড়েন না। *অন্নদামঙ্গল*-এর প্রথম খণ্ডে (যে খণ্ডটিই শুধু আমাদের আলোচনার বিষয়) তো দেবতাদেরই অধিষ্ঠান—তাঁরাই এখানে মুখ্য কুশীলব, নরখণ্ডের বর্ণনা এখানে অতি সংক্ষিপ্ত। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ভারতচন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনা মোটামুটি মঙ্গলকাব্যের চরিত্রভাবনারই অনুসারী।

মঙ্গলকাব্যে সাধারণভাবে চরিত্র বিভাজনের যে রীতি (দেব চরিত্র, শাপভ্রষ্ট দেবতা এবং মানব চরিত্র) ভারতচন্দ্র সেই প্রথা মেনেই অগ্রসর হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখবার কথা হল এই—ভারতচন্দ্র কবিতা লিখছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে—যখন গোষ্ঠী-চেতনা অবক্ষয়িত, সুস্থ ব্যক্তিচেতনারও জন্ম হয়নি, ফলে ভারতচন্দ্রের চরিত্ররা (দেবতা হলেও) চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছেন সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে, যে-সমাজে বিশ্বাসহীনতা জন্ম দিচ্ছে সংশয়ের আবহকে। অন্যভাবে বলা যায় ভারচন্দ্রের দেব চরিত্ররাও পাঠকের সামনে সমাজকে তুলে ধরছেন তার নানা মাত্রা নিয়ে।

।। অন্নপূর্ণা চরিত্র ।।

মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী ভারতচন্দ্র কাব্যের সূচনা (গীতারম্ভ) করেছেন দেবচরিত্র সতীকে দিয়ে—ইনিই ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা। 'গীতারম্ভ' অংশে ভারতচন্দ্র অন্নদার দৈবী-রূপের কথা বলেছেন। জানিয়েছেন পুরাণে 'সতী' সংক্রান্ত যাবতীয় প্রসঙ্গ—সতীর দক্ষালয়ে (পিতৃগৃহে) গমন, শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ ইত্যাদি বিষয়। প্রসঙ্গত দশমহাবিদ্যার বিষয়টিও উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই—তার পরেই 'সতী'-র দৈব মহিমার খোলসটি অনাবৃত হয়ে যায়। প্রকাশিত হয় দেবীর মানবী রূপ। সতীর প্রথম সংলাপ শিবের কাছে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি প্রার্থনা :

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥

স্বামীর কাছে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। বাপের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ আসেনি, কিন্তু বাঙালি মেয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় থাকে না। বস্তুত পিতৃগৃহ তো বাঙালি মেয়েদের কাছে ছিল মানসিক আশ্রয়ের জায়গা। শাক্ত পদাবলীতেও এই কন্যা-রূপিণী দেবীকে আমরা পাই। সতীর পিতৃগৃহে যাবার আবেদনে শিব অবশ্য প্রথমে অনুমতি দিতে নারাজ ছিলেন—আর তখনই দেবীকে দশ মহাবিদ্যার রূপটি দেখাতে হয়। শিবকে তখন বাধ্য হয়ে অনুমতি দিতে হয়। বাঙালি বিবাহিত মেয়েরা দশমহাবিদ্যা রূপে প্রকট না হতে পারলেও যে-ভাবেই হোক পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি আদায় করে নিত। কারণ মধ্যযুগের পুরুষ-শাসিত সমাজে বিবাহিত মেয়েদের কাছে বাপের বাড়ি ছিল নিজেকে ফিরে পাওয়ার জায়গা। 'সতী'-র বাপের বাড়ি যাওয়ার আবেদনের মধ্যে হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে এরকম ভাবনা রয়ে গেছে।

এরপরে অন্নদা চরিত্রেও আর দৈবী মহিমার নির্মোক রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নি ভারতচন্দ্র। নেশাখোর স্খলিত-চরিত্র শিবের পত্নী হিসেবে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। উমাকে পেয়ে শিব বেশ আনন্দিত। বিয়ের পর বাঙালি মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার 'art'-টি বোধহয় তাদের স্বভাবের মধ্যেই থাকে। ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণারও ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নেশাখোর বৃদ্ধ শিব ও তাঁর অনুচরদের নিয়ে উমার কোন অসুবিধে হয়নি, কোন অভিযোগও নেই। শিবের অনেকদিন সিদ্ধি খাওয়া হয়নি—অতএব তার আয়োজন করতে বললেন অনুচর নন্দীকে। আর এই সিদ্ধি ঘোটার সমারোহে হৈমবতী রাগ করেন না, বরং দেখা গেল 'হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল।' বাঙালি মেয়েরা বৃদ্ধ স্বামীকে বোধহয় একটু বেশিই আস্কারা দিয়ে থাকে—অন্তত হৈমবতীকে দেখে তো তাই মনে হয়।

আমরা আগেই বলেছি আঠারো শতকের সমাজবাস্তবকে ভারতচন্দ্র পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন চরিত্রের মাধ্যমে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডে তো প্রায় সকলেই দেবচরিত্র। অতএব দেবচরিত্রদের মধ্য দিয়ে ভারতচন্দ্রকে সমাজের বার্তাটি পৌঁছে দিতে হয়েছে পাঠকের কাছে। ফলে দেবচরিত্ররা ভারতচন্দ্রের কাব্যে মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। সে-সময়ে কৌলীন্য প্রথার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তার নিদর্শন স্বয়ং শিব ও অন্নপূর্ণা। এক অবক্ষয়িত মূল্যবোধ অষ্টাদশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করেছে—সেই সমাজের চিত্র আঁকছেন ভারতচন্দ্র। কৌলীন্য প্রথার বাড়বাড়ন্তের পাশাপাশি ছিল পুরুষের বহুচারিতা ও যৌনশিথিলতার আধিক্য। পার্বতী পরমেশ্বর যুগল রূপের কথা পুরাণে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র সুকৌশলে এই পৌরাণিক concept-কে আশ্রয় করে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজকে অনাবৃত করেছেন। দাম্পত্য জীবনের শুরুতে শিবের অর্ধনারীশ্বর (অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে। হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে।।) হওয়ার প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় দেবীর উক্তিটি এক্ষেত্রে স্মরণীয় :

হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃত পতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥

পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়।

এখানেই দেবী থামলেন না—মোক্ষম আঘাতটি এবার হানলেন :

অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

দেবী কি নারীবাদী হয়ে গেলেন? না ইনি দেবী নন—মধ্যযুগের এক বিশেষ কালের গৃহবধূ। স্বামীর প্রতি, পুরুষ সমাজের প্রতি নারী যে অব্যক্ত অভিমান পুষে রাখে—ভারতচন্দ্র তাকেই অন্নদারূপী গৃহবধূর মুখের ভাষায় স্থান দিয়েছেন। আর তাতেই তীব্র ভাবে প্রকাশ পেয়েছে সে-যুগে নারীর সামাজিক অবস্থানের বৈষম্যের দিকটি। এভাবেই ভারতচন্দ্র চরিত্রের মাধ্যমে একটা বিশেষ কালের সমাজকে পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ করান—এ কৃতিত্ব বড় কম নয়।

আমরা জানি কাব্যের নাম *অন্নদামঙ্গল*—অন্নদাতা অন্নপূর্ণাকে নিয়েই কবির কাব্য রচনা। সুতরাং 'অন্ন'-যে এ-কাব্যের মূল আশ্রয়ভূমি হবে তাতে তো কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। হর-গৌরীর বিবাহ সম্পন্ন হল—মধুচন্দ্রিমাও একদিন শেষ হল। এবার তো সংসারের বাস্তবের কঠিন গ্রন্থি মোচনের পালা। স্বাভাবিক ভাবেই হর-গৌরীর কোন্দল শুরু হয়—দরিদ্রের সংসারে যেটা অনিবার্য। গৃহকর্তা শিব কিছু করেন না—তবে তিনি জানেন 'স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র'। স্ত্রী-ভাগ্যে ধনের অধিকারী হননি—কিন্তু পুরুষ-ভাগ্যে দুটি পুত্রসন্তানের জন্মদাতা হয়েছেন। অতএব তাঁর মনে হতেই পারে 'গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী'। এসব শুনে কোন্ বিবাহিত নারীর পক্ষে সংযম রাখা সম্ভব—উত্তর দিতেই হয় :

ক. শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
খ. চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হইল চণ্ডী॥
গ. আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়।
ঘ. উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
....
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান
.....
ছোট পুত্র কার্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নেই ময়ূর উড়ায়॥
[আজকের ধনী-সন্তানের মতো?]
ঙ. সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে।
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥

ভারতচন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনার যে বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষ করার মতো তা হল কবি কিন্তু শিব ও শিবার মধ্য প্রত্যক্ষ কোন্দল দেখান নি। শিবের অভিযোগের উত্তর গৌরী দিয়েছেন পরোক্ষে, সখী জয়াকে সাক্ষী মেনে। বাঙালি গৃহিণী স্বামীর প্রতি অভিযোগ (যে-অভিযোগ একান্তই ন্যায়সঙ্গত) করার ক্ষেত্রেও কিছুটা সংযমের পরিচয় দেয়। আমাদের উল্লিখিত 'ক' ও 'গ'-এর চরণগুলিতে তারই পরিচয় আছে—'ক'-এ দেবী জানাচ্ছেন শিবের অভিযোগের উত্তরে তাঁরও বলার মতো কিছু আছে, কিন্তু তিনি বলবেন না কারণ তাতে ব্যাপারটি অন্য রূপ নেবে--একই রকমভাবে 'গ'-উদাহরণে দেখা যাচ্ছে শিব ধন নিয়ে দেবীকে আগে খোঁচা দিয়েছেন—দেবী জানাচ্ছেন এর যোগ্য জবাব তিনি দিতে পারতেন কিন্তু তা সংগত (উপযুক্ত) হবে না। এই মাত্রাজ্ঞান বাঙালি পুরুষের চেয়ে বাঙালি নারীদের মধ্যে যে বেশি দেখা যায় ভারতচন্দ্রের পর্যবেক্ষণে তা ধরা পড়েছে। রাজসভার কবির দৃষ্টি যে শুধু রাজসভাব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তা যে জনপদের মানুষকেও ছুঁয়ে গেছে তার প্রমাণ দেবীর এইসব সংলাপ। ক্রোধের বশে পুত্রদেরও দেবী রেয়াৎ করেন নি (দ্র. 'ঘ' অংশ)। আর সব শেষে হরের সংসারে তাঁর দুরবস্থাজনিত খেদ প্রকাশ পেয়েছে। তবে এ-সবের আগে কবি আমাদের দেখিয়েছেন এক অকর্মণ্য স্বামীর অসহায় স্ত্রীর ভূমিকায় দেবীকে, যিনি শুধুমাত্র শিবগৃহিণী নন—দুটি শিশুপুত্রের জননীও। অভাব-জর্জরিত পরিবাবে মায়ের সবচেয়ে বড় বিপন্নতা তো সন্তানদের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে না পারা। দেবীর সেই অসহায় আর্তি অসামান্য শিল্পরূপ পেয়েছে কবির কাব্যে :

দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহি ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥

এখানে দেবী আর মানবী জননী কিন্তু সমার্থক হয়ে গিয়েছেন—আর এঁরা উভয়েই এই শতাব্দীরই সৃষ্টি। আসলে ঐ সময় সাধারণ মানুষের ওপর নানাবিধ শোষণ চলছিল। এই শোষণের ভয়াবহ রূপ ভারতচন্দ্র দেখেছেন—বুঝেছেন এই শোষণের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। তাই অন্নের জন্যে গোটা কাবো হাহাকার—গোটা *অন্নদামঙ্গল*-এ ছড়িয়ে আছে সন্তানের মুখে অন্ন জোগাতে না পারার বেদনা। ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনাও সীমাবদ্ধ থেকেছে সন্তানদের জন্যে অন্ন প্রার্থনার মধ্যে। কবি এখানে নিজের সন্তানদের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে না পারার অসহায়তার মধ্যে দিয়ে সমকালের অন্নাভাবের বাস্তবকেই মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন।

এবারে অন্নপূর্ণার একটা অন্য ভূমিকার কথা আলোচনা করব—অবশ্যই সেটা প্রতীকী ভূমিকা। রাজসভাব কবি হয়ে ভারতচন্দ্র তো রাজা-ভূস্বামীদের শোষণের নিন্দা করতে পারেন না। রূপকের আড়ালে এঁদের কথা বলতে হয়। শিবের সঙ্গে কলহের জেরে দেবী বাপের বাড়ি যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সখী জয়া দেবীকে বাপেব বাড়ি যেতে মানা করলেন--শিব ভিক্ষায় বেরিয়ে যাতে কোথাও অন্নভিক্ষা না পান সেই ব্যবস্থা করতে বলেন দেবীকে। কারণ তাতেই শিব অন্নদার মাহাত্ম্য বুঝতে পারবেন। জয়ার উপদেশ :

তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া
রাখহ আপন কাছে॥

অন্নপূর্ণা পৃথিবীর সব অন্ন হরণ করায় শিব কোথাও ভিক্ষা পেলেন না—এমনকি লক্ষ্মীও

তাঁকে নিরাশ করলেন—কারণ তাঁর ঘরও অন্নহীন। এবারে লক্ষ্মীই রহস্যভেদ করলেন। তিনি শিবকে জানালেন :

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা

অন্নপূর্ণার খেলায় শিবের প্রাণসংশয়, আর অন্নপূর্ণারূপী ভূস্বামী ও মজুতদারদের খেলায় তৎকালীন সাধারণ মানুষের অন্নহীন থাকা ছাড়া কোন রাস্তা ছিল না। আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি এই বাস্তবকেই এঁকেছেন তাঁর কাব্যে অন্নপূর্ণার চরিত্রকে আশ্রয় করে।

অন্ন-ই *অন্নদামঙ্গল* (প্রথম খণ্ড) কাব্যের মূল 'থিম' এবং তাই কাব্যের উপাস্য দেবীর নামও অন্নপূর্ণা—একথা অন্নদা চরিত্র আলোচনায় বার বার অনুভূত হয়। কাব্যের শেষাংশে কাশীতে শিবের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে অন্নদা ব্যাসকে ছলনা করেন জরতী মূর্তি ধারণ করে। ব্যাস অন্নদারও ভক্ত—কিন্তু শিব তো পতি। সুতরাং পতিকে 'ডিফেণ্ড' করতে ভক্তকে ছলনা করে শিক্ষা দিতে হয়। এ এক অন্য রাজনীতির খেলা—যে খেলায় ন্যায় নীতির কোন বালাই নেই, যে-খেলায় নিজেদের শ্রেণী সংগঠন (গিণ্ড) বাঁচাতে (দ্র. ব্যাস হরিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিষ্ণুর কাছ থেকে সেভাবে কোন সাহায্য পাননি—বিষ্ণু শিব-বিষ্ণু জোটকেই অধিক মান্যতা দিয়েছেন) দেবীকে ভক্তকেও ছলনা করতে হয়—অনৈতিকভাবে হলেও (দ্র. ব্যাসের উক্তি 'শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া। কি গুণ বাড়িল তবে ব্যাসেরে ছলিয়া')। অষ্টাদশ শতকের ঘৃণ্য রাজনীতির ছায়া হয়তো অন্নদার ব্যাস ছলনায় পাঠক আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু যে-বিষয়টি আমরা বলতে চাইছি তা হল ব্যাস ছলনায়ও সেই অন্নের কথা কবি ভুলতে পারেন নি। শিবের মতো ব্যাসও দ্বারে দ্বারে ঘুরেও অন্নভিক্ষা পাননি—প্রয়োজন হয়েছে অন্নদার কৃপা। অন্নদার জরতী মূর্তির রূপায়ণে কবি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন—আর শেষে কবি বলেই ফেললেন :

বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম সার॥

শেষ পর্যন্ত কবি দেবী অন্নপূর্ণাকে—অন্নের ভাণ্ডার যাঁর করায়ত্ত, বিশ্ব যাঁকে অন্নদাতা হিসেবে মান্য করে তাঁকেও নিরন্ন মানুষের প্রতিনিধি রূপে পাঠকের কাছে উপস্থিত করলেন।

এইভাবে কবি অন্নপূর্ণা চরিত্রকে গড়ে তুলেছেন—মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যে দেবীর এই রূপ নতুন এবং অভিনব। মঙ্গল কাব্যধারার শেষ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় আমরা এক নতুন দেবীকে পেলাম যার মধ্যে দেবীর ঐশ্বর্যরূপের সঙ্গে সমন্বিত হল জননীর বাৎসল্য রূপের। এর আগে কোন দেবী-ই অন্নদাতা জননী রূপে দেখা দেন নি। ভারতচন্দ্রের, তথা কৃষ্ণচন্দ্রের উপাস্য দেবী অন্নপূর্ণাই প্রথম বাঙালির অন্নদাতা জননী হিসেবে জনমানসে স্থান করে নিলেন।

॥ শিব চরিত্র॥

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডের বিস্তৃত পরিসরে শিবের অবস্থান। সতী ও উমা— দেবীর দুই জন্মেই শিব আছেন। এক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে শিবকে সতীপতি ও উমাপতি হিসেবেই *অন্নদামঙ্গল*-এ উপস্থিত করেছেন। তবে সতীপতি শিবকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্যে কবি মহাভাগবত পুরাণের অনুসরণ করেছেন। ঐ সূত্র অনুসারে কারণজলে প্লাবিত চন্দ্রানলরবি-বিরহিত অন্ধকারে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিনজনেই তপস্যায় রত ছিলেন। তাঁদের

পরীক্ষা করার জন্য দেবী অন্নপূর্ণা শবরূপ ধারণ করে কাছে গেলে বিষ্ণু 'পচা গন্ধে ব্যস্ত হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি', ব্রহ্মার কাছে গেলে তিনি 'পচা গন্ধে ভাবি দুখ ফিবিয়া ফিরিয়া মুখ'। এরপর দেবী .

বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব সঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বলিতে হইল ঠাঁই
যত্নে ধবি বসিলা চাপিয়া॥
দেখিয়া শিবের কর্ম তাহাতে বসিল মর্ম
ভার্যারূপা ভবানী হইলা।

সতীব দক্ষালয়ে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা এবং নারাজ শিবকে অনুমতি দিতে রাজি করানোর বিষয়টিও মহাভাগবতের পুরাণ অনুসারেই বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে কবি শিবকে যে লৌকিক স্তরে নিয়ে আসবেন তার সূচনাও এখানে হয়েছে। সতী শিবের কাছে অনুমতি চাইছেন পিতৃগৃহে যাবার জন্য .

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপাব ভবন॥

শিব নিমন্ত্রণ না থাকার কথা বললে সতীব উত্তর

সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥

অনাযাসে যাকে মানবিক বাস্তবের ছবি বলা যায়। এখানে ভাবে ভাষায় লোকায়ত ভঙ্গিমাব আভাস পাওয়া যাচ্ছে—এরপর সতী শিবের সামনে দশমহাবিদ্যা রূপ প্রকট করলে অনুমতি দেওয়া ছাড়া শিবের আর কোন উপায় থাকে না। কবি এভাবে মানবিক বাস্তবতা ও পুরাণ-কথিত শিবের দৈবী মহিমার অনায়াস মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

পুবাণে দক্ষযজ্ঞের কথা আছে, যে-যজ্ঞস্থলে শিবনিন্দা শুনতে অসমর্থ সতী প্রাণত্যাগ করলেন। এরপরে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড, দক্ষের মৃত্যু, প্রসূতির প্রার্থনায় দক্ষের পুনবায় জীবন লাভ, সতীর অভিশাপে দক্ষের ছাগমুণ্ড হওয়া, প্রাণ ফিরে পেয়ে দক্ষের শিব বন্দনা, সতীর দেহ স্কন্ধে শিবের পৃথিবী পরিক্রমা এবং বিষ্ণু কর্তৃক সতীর দেহকে ৫১টি খণ্ডে বিভাজনে এবং ঐ খণ্ডগুলি বিভিন্ন জায়গায় পড়ে তীর্থস্থানে পরিণত হওয়া—এইসব পৌরাণিক তথ্যকে কবি কাব্যে প্রায় যথাযথ ভাবে এনেছেন। কিন্তু এই পৌরাণিক অনুসৃতি সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র এখানে একটু অন্যভাবে শিব চরিত্রকে তুলে ধরলেন পাঠকের কাছে—পৌরাণিক মহিমার সঙ্গে শিবের প্রেমিক রূপটিকেও কবি আঁকলেন বেশ যত্ন সহকারে। সতীর দেহত্যাগের পরে নন্দী 'শূন্য রথ লয়ে, শোকাকুল হয়ে' শিবকে সতীর মৃত্যুসংবাদ দিলে পতি হিসেবে শিবের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ব্যক্ত করে ভারতচন্দ্র জানালেন ·

শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন।

আব তার পরে

লয়ে নিজগণ করিলা গমন
করিতে দক্ষ দমন।

দক্ষযজ্ঞ বিনষ্টের পর :

যজ্ঞস্থানে সতীদেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥

সতীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে শিব কাঁদছেন, তারপরে ক্রোধ, দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে সতীর মৃতদেহ দেখে আবার কেঁদেছেন—একেবারে সাধারণ প্রেমিকের মতোই এই প্রতিক্রিয়াটি। শিবের প্রেমিক রূপের (অবশ্য শাস্ত্রীয় সমর্থন ছিল) এই চিত্র ভারতচন্দ্রের লেখনীর গুণে বেশ উজ্জ্বল। আমরা পরে দেখব বিবাহোত্তর (শিব-উমার) পর্বে উমার প্রতি শিবের প্রেম নিবেদনের ছবি—যা দুটি লোকায়ত নর-নারীর হৃদয়-বিনিময়ের ছবিকেই যেন পাঠকের সামনে উপস্থিত করে। কবি যে এরপর আর শিবের দৈবী মহিমা কীর্তন করবেন না, তাঁকে লোকায়ত স্তরে নামিয়ে আনবেন তাঁর ভূমিকাও কবি এখানে করে রাখলেন।

পুরাণে আছে সতীর দেহ খণ্ডিত হওয়ার পর শিব হিমালয় পর্বতে ধ্যানে বসেন। *কুমারসম্ভব* কাব্যে শিবের যে ধ্যানরত মূর্তি কালিদাস এঁকেছেন তাতে শিবের পৌরাণিক মহিমা পুরোপুরি বর্তমান। মদনের বাণ নিক্ষেপে তপস্যা ভঙ্গ হলে শিবের অভিশাপে মদন ভস্মীভূত হন—কিন্তু তাতে তাঁর কোন বিচলন হতে দেখা যায় নি। ভারতচন্দ্র কিন্তু এই অংশে শিব-মহিমা শুধু খর্বই করেন নি, শিবকে যে পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন তাতে আমাদের ঔচিত্যবোধও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মদনের প্রয়াসে শিবের ধ্যানভঙ্গ হলে শিবের নৈতিক চ্যুতির যে-বিবরণ কবি দিয়েছেন তা এইরকম :

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাঁহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর দেখয়া অন্তর
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

একে কী বলব—শিবের লোকায়তকরণ—না, এ-শিব অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লেদ-পঙ্কিল জীবনকেই প্রকট করে। অর্থাৎ যুগের দাবি মেনেই শিব চরিত্রের এই অবনমন। আর যে-তথ্যটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল রাজসভার কবি হিসেবে ভারতচন্দ্রের প্রধান দায় ছিল রাজা ও রাজসভাসদদের মনোরঞ্জনের। 'শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম' অংশে ভাবতচন্দ্র নিজেই সেকথা জানিয়েছেন :

কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায়গুণাকর॥

শেষ পর্যন্ত নারদ শিবকে শান্ত করেন এই বলে—

দক্ষগৃহ ছাড়ি হেমন্তের বাড়ি
জনমিলা সতী আসি॥
বিবাহ করিয়া তাঁহারে লইয়া
আনন্দে কর বিহার।

বিবাহের ব্যাপারে শিবের দেরি সইছিল না। নারদ তখন শিবকে বলেন .

প্রায় হয়ে বুড়া ভুলিয়াছ খুড়া
দিন দুই স্থির রহ॥

শিবের প্রতি নারদের উপদেশে কিন্তু সমাজসত্যের এক নির্মম দিকের প্রকাশ ঘটেছে। কৌলীন্য প্রথার কারণে তখন বিয়ের পাত্রদের অধিকাংশের যথেষ্ট বয়স হত। আর এই বৃদ্ধ পাত্ররা পুনরায় বিবাহ করার জন্য প্রচুর আগ্রহ দেখাত। অল্পবয়সী কন্যারা সমাজের নির্মম প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হত। ভারতচন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আমবা আগে বলেছিলাম যে, ভারতচন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্ররা সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে যুক্ত। শিবের চরিত্রে আমরা দেখলাম সমাজেরই একটা ঘৃণিত প্রথা কীভাবে শিবের আচরণে প্রকট হয়ে পড়েছে।

'শিব বিবাহ যাত্রা', 'শিব বিবাহ'—কাব্যের এই দুটি অংশে যে শিবকে কবি এঁকেছেন তাঁর মধ্যে পৌরাণিক মহিমার চিহ্নমাত্র নেই—তিনি পুরোপুরি লোকায়ত জীবন-সম্ভূত। কবির উদ্দেশ্যও সেরকমই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনিকেত জীবনে দেবমহিমায় অখণ্ড বিশ্বাস রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই দেবতাদের নিয়ে যে-উপহাস কবি করেছেন তা সম্ভবত যুগেরই বার্তাবহ। আর মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যেব ধারায় শিবের লোকায়ত রূপেব আদরও কম নয়। ভাবতচন্দ্র যা করেছেন তা হল শিবের সেই লোকায়ত identity ব পুনরুদ্ধাব আর তাতে মিশিয়েছেন হাসির উপাদান (সূক্ষ্মভাবে সেই হাসির সঙ্গে মিশে থাকে ব্যঙ্গ)। তবে হাস্যরসের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই স্থূল অশ্লীলতার প্রকাশও ঘটে গেছে—এয়োগণকে সঙ্গে নিয়ে শিববরণের (স্ত্রী আচাব) দৃশ্যটি তারই নিদর্শন। মেনকার সামনে ·

বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥

প্রদীপ নেবালে কি হবে ভারতচন্দ্র তো দৃশ্যটি প্রলম্বিত করবেন, তাই 'শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়॥'

আসলে ভারতচন্দ্র ভুলতে পারেন না তাঁর রাজসভার কবিসত্তাকে, অথবা তাঁকে ভুলতে দেওয়া হয় না। তাই তাঁর শিব চরিত্রের পরিকল্পনাতেও অশ্লীলতার ছোঁয়া লাগে। পরে অবশ্য 'শিবের মোহন বেশ' অংশে কবি নিজেকে defend করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত, তিনি যুগেরই কবি—ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* যুগেরই দর্পণ—এখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এহেন সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তিও আছে। শিবের বিবাহ-সংক্রান্ত অংশগুলি মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কৌলীন্য প্রথায় জর্জরিত বাংলাদেশের বাস্তব চিত্রের বাঙ্ময় প্রকাশ। উমার মা-বাবা কেউই বর (শিব)-কে আগে দেখেন নি—নারদের (ঘটক) কথা শুনেই তাঁরা উমার পাত্র হিসেবে শিবকে নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে অন্যরকম করা বা ভাবা কি সম্ভব ছিল—কন্যার জন্যে পছন্দ মতো পাত্র নির্বাচনের সুযোগ বা অবকাশ কি তাঁদের ছিল? ছিল না। কুল বাঁচাতে এবং দারিদ্র্যেব কারণে বাংলাদেশের অসহায় পিতা-মাতা তাঁদের কন্যাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হতেন। *অন্নদামঙ্গল*-এর বিবাহসংক্রান্ত দৃশ্যগুলিতে আলোচ্য শতকের শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের দেখালেন সমাজের এক বিয়োগান্ত দৃশ্য—এক কমনীয়া কুমারীর বৃদ্ধ বরের প্রতিমূর্তি হিসেবেই শিব তাই সমকালের 'বাস্তব' চরিত্র হয়ে ওঠেন। এই বিবাহ দৃশ্যাবলীতে হিমালয় যথেষ্ট সংযতবাক

এক পিতা যিনি বরকে দেখে 'বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি'—কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া জানান না। কারণ জানেন এটাই কন্যার ভবিতব্য—নারদ উপলক্ষ মাত্র। আর মেনকা—নারদকেই এ-সব কিছুর জন্যে দায়ী করে বলেন :

ও রে বুড়া আটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

কন্যার মা তো' তাঁর পক্ষে এরকম প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। ভারতচন্দ্রের সব চরিত্রই 'type'—সমালোচকদের মোটামুটি এটাই অভিমত। প্রসঙ্গত মুকুন্দের সঙ্গে তুলনাও এখানে এসে যায়। সমালোচকদের অভিমত অনেকটাই গ্রাহ্য—তবে এ-ক্ষেত্রে যে সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত থেকে চরিত্ররা উঠে আসছে সেই পরিপ্রেক্ষতটিও আমাদের স্মরণে রাখতে হয়। কারণ আমরা দেখলাম একই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দুজন মানুষ তাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনা-আবেগ অনুযায়ী দু-ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন—ভারতচন্দ্রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তা ধরাও পড়েছে। চরিত্র পরিকল্পনায় বিষয়টি অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য।

ভারতচন্দ্র শিবের প্রেমিক মূর্তিটি কিন্তু বার বার দেখিয়েছেন—প্রথমে সতীর মৃত্যুর পর, পরে বিবাহোত্তর হরগৌরীর কথোপকথন পর্বে। মর্ত্যে নর-নারীর মধুচন্দ্রিমার যেন ছায়া পড়েছে এই পর্বে। এ-শিব লোকায়ত অবশাই, কিন্তু কোথায় যেন একটু অন্যরকম। বিয়ের পর উমার প্রতি শিবের approach-টাই অন্যরকম (অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে কবিদের treatment-এ শিবের প্রেমিক মূর্তিটি ঠিক এভাবে প্রকাশ পায় নি)—মানবসংসারে প্রেমিক স্বামী যেমন তার প্রেমিকা স্ত্রী-কে প্রেম নিবেদন করে ঠিক সেইরকম ভাবে শিব গৌরীকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এতদিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ি॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আর বার।
সত্য করে কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥

শেষ পঙক্তিটি মানব সংসাবের চিরন্তন প্রেমের শর্ত হিসেবেই গ্রাহ্য। এক্ষেত্রে পঙক্তিটি শিবের মুখে কিন্তু অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। সদ্য বিবাহিত (বয়সের পার্থক্য পাঠক ভুলে যান) শিব-পার্বতীর হৃদয় বিনিময়ের যে অন্তরঙ্গ ছবি (এমন মনে হয় কবি যেন সেই ঘরে উপস্থিত থেকেই সব শুনেছেন) পাঠককে উপহার দিলেন কবি তা এক কথায় অনবদ্য— যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবির শ্লাঘার বিষয়। শিবের প্রেম নিবেদনের উত্তরে উমা অবশ্য শিবকে বিদ্ধ করতে ছাড়েননি কিন্তু তাতে কোন তীব্রতা নেই ঝাঁঝ নেই—এরকম ভাবে বিদ্ধ হতে যে-কোন পতিরই ভাল লাগবে—শিব তাই উমার কথা গায়ে না মেখে উমাকে অর্ধাঙ্গে ধারণ করার কথা বলতে পারেন। উমা অনেক বাস্তব অসুবিধের কথা বলেও শেষে রাজি হয়ে যান (মধুচন্দ্রিমা-পর্বে এটাই তো স্বাভাবিক); তখন :

দুই জনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে॥
এইরূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইল কুমার॥

হর-গৌরীর এই কথোপকথন অংশে পৌরাণিক প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু পার্বতী-পরমেশ্বরের

যুগল মূর্তি অঙ্কনের অছিলায় যে মানব-মানবী-কে কবি আঁকলেন সে-চিত্র উৎকর্ষের শিখর-দেশ স্পর্শ করেছে।

এর পর সংসার জীবনের বাস্তবতা। দুটি পুত্রসন্তান নিয়ে হর-গৌরীর সংসার। পরিবারের কর্তা প্রেমিক হতে পারেন কিন্তু কর্তব্যকর্মে উদাসীন। নিজের অক্ষমতার দায়ভার অনায়াসেই স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দিতে এক মুহূর্তও সময় লাগেনা তাঁর (বাঙালি পুরুষের সাধারণ চারিত্র্য লক্ষণ রূপেই কবি বোধহয় শিবকে এইভাবে এঁকেছেন)। 'হরগৌরী কন্দল' অংশে কবি শিবকে একেবারে লোকায়ত স্তরে নামিয়ে আনলেন। সমকালের সাধারণ পুরুষের মতো শিবকে আচরণ করতে দেখা গেল। সেকালে বিবাহিত কুলীন পুরুষদের উপার্জনের প্রয়োজন হত না। কারণ কিছুদিন অন্তর অন্তর এক একজন স্ত্রী-র পিতৃগৃহে কাটিয়ে আসতে পারলে বছর ঘুরে যেত। শিবের কপাল অবশ্য অতটা ভাল ছিল না। তাছাড়া শিবের কথায় যে-গৃহিণী চণ্ডীর মতো 'গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী'—তাঁর তাড়নায় শিবকে অগত্যা ভিক্ষেয় বেরোতে হয়। ভিক্ষায় গমনোদ্যত শিবের অবস্থার বর্ণনায় কবির সহানুভূতি (পাঠকেরও) শিবের দিকেই :

বেলা হৈলা অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥

ক্ষুধার অনিবার্যতায় শিবকে ভিক্ষায় বেরোতে হয়, কিন্তু অভিমানটুকু পুরোমাত্রায় বজায় আছে—

ঘর উজারিয়া যাব ভিক্ষা যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিৎ বনবাস॥

এখানে কি শিবের আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে কবির উপদেশও মিশে গেছে?

আসলে বিবাহোত্তর হর-গৌরীর জীবনে অভাব-অনটনজনিত নিত্য বিবাদের যে-ছবি কবি এঁকেছেন তাতে শিবের ভূমিকা এক সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের—যিনি সব দায়ভার স্ত্রীর ওপর চাপাতে চাইলেও মনে মনে জানেন এই অবস্থার দায় তাঁরও। তাঁর বোধে অজ্ঞাত থাকে না যে তিনি সমকালের এক দরিদ্র সরল মানুষ—বয়সের কারণে চাষ-বাস-বাণিজ্য কোন কাজের মাধ্যমেই উপার্জনে অক্ষম। তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষায় বেরোতে হয়—সমকালের এই ধরনের মানুষের অনিবার্য পরিণতি শেষ পর্যন্ত শিবকেও মানতে হয়। প্রচ্ছন্নভাবে পৌরাণিক তাৎপর্য থাকলেও এই অংশে কবি শিবকে দেবত্ব-বর্জিত এক অসহায় মানুষের প্রতিনিধি করেই এঁকেছেন। এই অসহায়তা আরও তীব্র মাত্রায় প্রকাশ পায়, যখন ভিক্ষাপ্রার্থী শিবের মধ্যে এক পাগল ভিক্ষুকের কৌতুক-উদ্রেককারী রূপটি ফুটে ওঠে, যাকে পথের বালকেরাও অবজ্ঞা করে। আর 'চেত রে চেত রে চিত ডাকে চিদানন্দ'—বলে শিব আপন পৌরাণিক মহিমা প্রকাশ করেও শেষ পর্যন্ত অন্নসংস্থানে ব্যর্থ হন। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌরাণিক মহিমা এমন মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছিল—তাই শিবের 'চেত রে চেত রে চিত' ডাক সাধারণ মানুষের ওপর আর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। এ এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা—সমকালীন বাংলার মানুষ যা প্রত্যক্ষ করেছেন। শেষ পর্যন্ত অন্নহীন শিবকে উচ্চারণ করতে হয় :

ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাদ।

তার কেন বিলাসের সাদ।

এই অনুশোচনার ভাষা আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীরই দরিদ্র-শোষিত মানুষের অসহায়তার ভাষা। ভারতচন্দ্র—সাধারণ মানুষের অসহায়তাকে রূপ দেওয়ার জন্যে শিবকে লোকায়ত স্তরে নামিয়ে এনেছেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারতচন্দ্রের পৌরাণিক শিবকে লোকায়ত জীবনে সাঙ্গীভূত করা অনিবার্যই ছিল। চরিত্রাঙ্কনে ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতার এ এক অনন্য নিদর্শন।

ক্ষেত্র গুপ্ত লোকায়ত এই শিবের মধ্যেই শিবরূপী বাংলার কৃষক-জনতার ছায়াপাত ঘটতে দেখেছেন। তিনি বলেছেন "অন্নের জন্য হাহাকার সারা দেশ জুড়ে না হোক, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে বেদনা-বিদীর্ণ কাহিনীর জন্ম দিয়েছিল, রাজসভার কবি তা ধরে রেখেছেন তাঁর কাব্যে। শিবের 'হা অন্ন হা অন্ন' বলে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনীর প্রেরণায় যে অন্য কিছু নেই তা বলা যায় জোর দিয়ে।" এই সূত্রেই তিনি বলেছেন 'অন্ন যার ঘরে/সে কাঁদে অন্নের তরে/এ বড় মায়ার পরমাদ।' এই উক্তিতে শিবরূপী বাংলার কৃষক জনতাব সত্যকার পরিচয় আছে, অন্নস্রষ্টার অন্নাভাবের বেদনা আছে, পৌবাণিক কাহিনীর পাতলা আবরণে যে সত্য ঢাকা পড়ে না।" [*প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*]

এই পৌবাণিক শিব-মহিমা একেবারেই ধূসর হয়ে গেল যখন অন্নপূর্ণা-প্রদত্ত অন্ন খেয়ে শিবের অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ে বালকের আনন্দ। ভারতচন্দ্রেব বর্ণনায় সেই ছবিটি এরকম :

পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিযা॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিযা॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥

শিবকে উপলক্ষ করে অন্নলাভে তৃপ্ত বুভুক্ষু মানুষের নির্মল আনন্দাতিরেক প্রকাশ ঘটেছে এই বর্ণনায়। পাঠকের মনে পড়তে পারে একালের অন্যতম মহৎ কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাসের প্রসঙ্গ। সেখানে দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের ভাগ্যে ভাত কদাচ জুটত। ভাত খেতে পাওয়ার সুযোগের দিন তাদের কাছে ছিল উৎসবের দিন। উপন্যাসের কথকের নিম্নবর্গীয় মানুষদের ভাত খাওয়ার দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দেখেছিলেন ভাত খাওয়ার আনন্দে উজ্জ্বল মুখের কিছু অভিব্যক্তি—যার সঙ্গে শিবের আনন্দের কোথাও যেন যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। অন্নহীন মানুষের আনন্দের কারণ তো কালে-কালান্তরে একই হওয়ার কথা।

এসব সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হয় ভারতচন্দ্র অন্নদার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য লিখেছেন—যেখানে দৈবী মহিমার সব নির্মোক খসিয়ে ফেলা যায় না—ঔচিত্যবোধের কারণেই। তাই 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' অংশে ভারতচন্দ্র যখন নিন্দাচ্ছলে অন্নদার মুখে প্রশংসামূলক ব্যাজস্তুতি বসিয়ে দেন, তখন কুলীন শিবের কৌলীন্য মহিমা হারিয়ে গেলেও তার মধ্যে থেকেই প্রকাশ পায় শিবের দেবমাহাত্ম্য। তবে সেই সঙ্গে স্বীকার করে নিতেই হয় যে, সামগ্রিকভাবে এই উপস্থাপনাভঙ্গি লৌকিকতাকেই প্রকাশ করে। লোকায়ত ও দৈবী মহিমা—

এই দুই বিপরীতের সম্মিলনে ভারতচন্দ্রের শিবচরিত্র গড়ে উঠেছে—তবে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শিবের মানব-ব্যক্তিত্বই অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমকালীনতার দাবি মেনেই শিবের মুখ দিয়ে কবি হরি ও হরের অভেদত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ শিব তো সমাজ-রূপান্তরের বার্তাবহ এক সমাজ-প্রতিনিধি। সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে *অন্নদামঙ্গল*-এর শিব অনন্য—মধ্যযুগের কোন কাব্যে—মুকুন্দ ও রামেশ্বর-অঙ্কিত শিব চরিত্রেও ভারতচন্দ্র-অঙ্কিত শিবের নানামুখী বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। 'নূতন মঙ্গল' রচনায় বসে এক অভিনব শিবকে কবি উপহার দিলেন পাঠককে—এ-কারণে ভারতচন্দ্রের কাছে আমাদের ঋণ থেকেই গেল।

॥ ব্যাসদেব চরিত্র ॥

দেবখণ্ডের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ব্যাসদেব। ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যে ব্যাসদেব পুরাণ-প্রণেতা দেবোপম চরিত্র। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে ব্যাসদেবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—ভারতচন্দ্র সেই সূত্রকে অবলম্বন করে ব্যাসদেবের চরিত্র পুনর্গঠন করেছেন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে। বস্তুত ব্যাসদেবের মতো একটি পৌরাণিক চরিত্রকে যুগ-প্রেক্ষিতে স্থাপন করে তাঁকে একই সঙ্গে যুগের সৃষ্টি এবং যুগন্ধর করে তোলার অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের চরিত্র নির্মাণ ক্ষমতার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ব্যাসদেব। আমরা জানি অষ্টাদশ শতাব্দী সংশয়ের যুগ হিসেবেই চিহ্নিত। দেবখণ্ডের শিব এবং অন্নদা চরিত্রে সেই সংশয়ের চিহ্ন বর্তমান। তবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতার পরিচয় সেখানে বিশেষ নেই। কিন্তু ব্যাসদেবের চরিত্রে যুগের সংশয় ও অস্থিরতা পুরোপুরি বর্তমান। আসলে ব্যাসদেবের চরিত্র নির্মাণের সূত্রেই কাব্যে নানা প্রসঙ্গ এসেছে—সেগুলি যেমন যুগচ্ছবি হয়ে উঠতে পেরেছে তেমনি তার মধ্যে দিয়ে কবি-অভিপ্রায়ও ব্যক্ত হয়েছে। ব্যাসদেবের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলি আলোচনায় উঠে আসবে।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাসদেবের চরিত্রকে type চরিত্র বলে মনে হলেও কোন বিশেষ ভাব বা তত্ত্বের বাহন তিনি নন। বরং যুগের অস্থিরতা ও সংশয় তাঁর চরিত্রে কিছুটা জটিলতারও সৃষ্টি করেছে। এ-প্রসঙ্গে একটি কথা প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল। ব্যাসদেবের চরিত্রকে অনেক আলোচক ভারতচন্দ্রের আত্মপ্রক্ষেপ হিসেবে দেখেছেন। ভারতচন্দ্রের সংঘাতময় জীবনের কথা ভাবলে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই বিচার করতে হয়। সেক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের জীবনের মূল ঘটনাগুলি একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের পিতার সঙ্গে বর্ধমান রাজপরিবারের সংঘাতের কারণে বালক কবিকে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করতে হয়। সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর অগ্রজেরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার মূল্য দেন না। জীবিকার জন্যে তাই ভারতচন্দ্রকে রামচন্দ্র মুনশির কাছে ফারসি ভাষা শিখতে হয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রীতি নয় প্রয়োজনই তখন বড় হয়ে ওঠে। জীবনের এই পর্বে কোন স্থিতি খুঁজে পান নি ভারতচন্দ্র। পাননি আপনজনের স্নেহচ্ছায়া। ব্যাসদেবও জীবনে প্রয়োজনকেই বড় করে দেখেছেন এবং তিনিও কোন স্থির ভূমির সন্ধান পান নি। অগ্রজদের ইচ্ছায় ভারতচন্দ্রকে জমিসংক্রান্ত কাবণে বর্ধমানে যেতে হয়। সেখানে তিনি ঘটনাচক্রে কাবারুদ্ধ হন। তবে কারারক্ষীর সহায়তায় কারাগার থেকে পালিয়ে কটকে চলে আসতে সমর্থ হন। সেখানে বৈষ্ণব সঙ্গ করতে করতে বৈষ্ণব ভেক ধরেন। এক বৈষ্ণবদলের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে তিনি খানাকুলে পৌঁছলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলে এবং তাঁকে সংসারে ফিরিয়ে আনে। ভারতচন্দ্রের জন্মান্তর হয়। এর পরের

ইতিহাস তো ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের কবি হয়ে ওঠার ইতিহাস। প্রথম বয়সে যে-কবি সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেছেন সেই কবি পরবর্তীতে 'চণ্ডী' নাটক রচনা করেন, রচনা করেন অন্নদার মহিমাজ্ঞাপক কাব্য *অন্নদামঙ্গল*। একই কবির বিভিন্ন দেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্যরচনায় কোন আনুগত্য বদলের পরিচায়ক নয়, প্রয়োজনের দাবি মেনেই এই বহুদেবতার উপাসনা। ব্যাসদেবের জীবনেও একই ঘটনা ঘটেছে। বৈষ্ণবভক্ত ব্যাসদেব স্বার্থসিদ্ধির আশায় শিবভক্ত হয়ে গেছেন। আবার যখন জেনেছেন যে শিবকে পরিচালনা করেন দেবী অন্নদা তখন তিনি দেবীর উপাসক হয়ে যান। আসলে অস্থির আর সংশয়ের যুগে এমনটাই হয়। ভারতচন্দ্রের জীবনের প্রথম দিকে অনেকটা সময় সমকালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে স্থিতিশীল ছিল না। ব্যাসদেবের জীবনও অস্থিরতার জীবন—স্থিতিশীলতার অভাবে ব্যাসদেবকে এক অনিকেত জীবন যাপন করতে হয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত কোন লক্ষ্যে তাঁর পৌঁছোনো হল না।

ভারতচন্দ্র নারায়ণ-অংশ রূপে ব্যাসদেবকে পাঠকের সঙ্গে পবিচয় করিয়েছেন—প্রসঙ্গত তাঁর পাণ্ডিত্য এবং পিতা-মাতার পরিচয়ও দিয়েছেন। নারাযণের অংশ—তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বৈষ্ণব—অন্য ধর্ম এবং সেই ধর্মের পূজ্য দেবতা তাঁর কাছে কোন মানে রাখেন না। তাই তিনি শিবের পূজক শৌনকাদি ঋষিদের শিব পূজাব অসারতা বোঝান .

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবেব সেবন॥
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই।
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম॥
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্য জনে।
মোক্ষফল পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥

উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে বেদব্যাসের একান্ত বৈষ্ণব নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে। এই নিষ্ঠার কারণ, একমাত্র নারায়ণ ভজনায় মোক্ষলাভ সম্ভব। ভারতচন্দ্র কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে ব্যাসদেবের অন্য ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করার কারণটি এখানে ছুঁয়ে গেছেন। কবি ব্যাসদেবের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন আজকের জীবন চর্যার সারকথা—'ভজনীয় সে জন যে মোক্ষ দেই'। কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে কাব্য লেখায় ভারতচন্দ্রের আর্থিক স্বাচ্ছল্য এসেছিল (অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটাই ছিল মোক্ষ)। সুতরাং তিনিই বলতে পারেন ধর্মে আস্থা রাখার ব্যাপারটি শর্তসাপেক্ষ। 'শিবপূজা নিষেধ' অংশটিতে ব্যাসদেবকে কেন্দ্র করে ভারতচন্দ্র তৎকালীন ধর্মীয় পরিমণ্ডলের একটা চিত্র এঁকেছেন। 'শিবপূজা নিষেধ' অংশের শেষে দেখা গেল :

এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥

আর,

ব্যাসদেব চলিলা লইয়া নিজগণ।
পথে পথে করি হরিনাম সংকীর্ত্তন॥

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্পষ্ট বিভাজনের ছবি। বাঙলার ধর্মীয় ইতিহাসে এরকম অন্তর্কলহের ছবি আগেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের ব্যাস সম্পর্কিত অংশে এই কলহ একটা

নতুন মাত্রা পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ব শতাব্দীর মতো দেবনির্ভর ধর্মবাদ আর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না—মানুষই নিজের প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করেছে। ব্যাসেব মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও আজকের রাজনৈতিক দলগুলির মতো (যারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও প্রসারিত করার জন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করে) নিজের স্বার্থে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এই দিক থেকে ভারতচন্দ্রের ব্যাসদেব ভবিষ্যতের বার্তাবাহক হয়ে ওঠেন।

বারাণসীতে পৌঁছে ব্যাস হরিভজনার সঙ্গে সঙ্গে শিবের নিন্দা শুরু করলেন। শিবনিন্দায় ক্রুদ্ধ নন্দী ব্যাসদেবের 'ভূজস্তম্ভ' 'কণ্ঠরোধ' করে শিবনিন্দার ফল ব্যাসদেবকে বুঝিয়ে দেয়। 'ভূজস্তম্ভ' কণ্ঠরোধের ব্যাপারটির ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র যুগপ্রবণতার ছায়াপাত ঘটালেন। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে একটা ক্ষীণ ঐক্যেব সুর শোনা যাচ্ছিল—সমকালীন জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসের দিকটি আর সেভাবে মানুষেকে প্রভাবিত করতে পারছিল না। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল দুটি শ্রেণী—একটি দেবতাদের, যারা দেবস্বার্থরক্ষায় তৎপর আর অন্যদিকে থাকল ব্যাসদেবের মতো জ্ঞানী মানুষেরা, যাঁরা স্থির প্রত্যয়ে আস্থা রাখতে পারছিলেন না—কারণ অবশ্যই দেবতাদেব শ্রেণী স্বার্থ বজায় রাখতে ভক্তদের বিশ্বাসকে উপেক্ষা কবা। কাব্য থেকে উদাহরণ নেওযা যাক

গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িলা সঙ্কটে।
কুণ্ঠভাবে উত্তরিলা ব্যাসের নিকটে।
বিস্তর ভর্ৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সেই শিব।
শিবেরে করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥

[লক্ষণীয় 'কুণ্ঠভাব' শব্দটি। দেখা যাচ্ছে দেবতারা সকলেই একই শ্রেণীভুক্ত—পরবর্তীকালে অন্নদাও শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে আশ্রয়প্রার্থীকে (ব্যাসদেব) ছলনা করছেন। বিষ্ণু যথেষ্ট কুণ্ঠা নিয়ে ভক্তের কাছে এসেছেন—এসবই প্রমাণ করে একান্ত আনুগত্যের কোন প্রশ্ন অষ্টাদশ শতকে ছিল না।]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ভারতচন্দ্র বুঝিয়ে দিলেন ইষ্টে নির্ভরশীল থাকা অর্থহীন, কারণ ভক্তের স্বার্থের সঙ্গে দেবতাদের শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বে ইষ্ট ভক্তের স্বার্থের মর্যাদা দেবেন না—শ্রেণী স্বার্থই তাঁর কাছে তখন বড় হয়ে দাঁড়াবে। কবি রূপকের আড়ালে সময়ের বাস্তবকেই তুলে ধরলেন।

ব্যাস বুঝলেন দেবতাদের অভিপ্রায়—বুঝলেন যে দেবতা বাঁচাবেন তাঁরই পূজা করা বাস্তবজ্ঞানের পরিচায়ক। অতএব ব্যাস শিবভক্ত হয়ে গেলেন, বৈষ্ণবের সব চিহ্ন মুছে দিয়ে শিব-অনুগত হয়ে গেলেন ব্যাসদেব। শিব কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে (অথবা বলা যায় শ্রেণী স্বার্থকে সম্মান দিয়ে) বিষয়টিকে ভালভাবে নিতে পারলেন না। তিনি জানালেন

মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥

....

হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

অভেদে দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস।
উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস॥

অতএব শিব জানালেন কাশীতে শিব ভিক্ষা পাবেন না। এই নির্দেশ ব্যাসদেবকে তিনদিন অনাহারে থাকতে বাধ্য করল। শেষ পর্যন্ত ব্যাসদেব কাশীবাসীকে অভিশাপ দিলেন :

কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী॥

ব্যাসদেবের চরিত্রের এই অ-নমনীয়তা তাঁর চরিত্রে অন্য মাত্রা এনেছে। ভারতচন্দ্র বুঝিয়ে দিলেন সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাস দাঁড়ালেন তার অর্জিত বিদ্যার সম্বল নিয়ে—অভিশাপ দিলেন কাশীবাসীকে—যে অভিশাপে 'ক্রমে তিন পুরুষের (কাশীবাসী) মোক্ষ না হইবে'। শুধু তাই নয় দেব-স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে দেবতা যে ভক্তকে পীড়ন করতে পারেন—ভিক্ষা বন্ধ করে তাকে অন্নহীন করে দিতে পারেন, ব্যাসের পরিণতি দেখিয়ে ভারতচন্দ্র দেব-চরিত্রের স্বার্থপরতাকে একেবারে অনাবৃত করে দিলেন।

এবার অন্নদাকে বাধ্য হয়ে আসরে নামতে হল সবদিক সামাল দিতে। আর কৃষ্ণচন্দ্রের উপাস্য দেবীকে দিয়েই যে সমস্যার সমাধান করতে হবে ভারতচন্দ্রের তা অজানা ছিল না। তবে তার মধ্যেও ভারতচন্দ্র দেবীর আচরণে অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরেছেন। উপবাসী ব্যাসকে অন্ন দিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন অন্নদা। বিনা স্বার্থে অবশ্য নয় কারণ অন্নদা জানেন তপস্যার বলে ব্যাসদেবের পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব—তাই তাঁকে নির্বল করতে হবে। কাশীর অধিবাসী—যারা শিবকে মোক্ষের উপায়রূপে জানেন তাদের অভিশাপ দেওয়ার ব্যাপারটি শিব মেনে নিতে পারেন নি। তবু শিব ব্যাসের কাছে জানতে চাইলেন তপস্বী কে—আর তার ধর্ম কি হওয়া উচিত। শিব হয়তো আশা করেছিলেন ব্যাসদেব বলবেন শিব-পূজকই তপস্বী। কিন্তু ব্যাসদেব তপস্বীর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিলেন যা শিবের পছন্দ না হওয়ারই কথা। ফলে শিবের আদেশ হল :

অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর।
পুন যেন আসিতে না পায় কাশীপুর॥

ব্যাস অবশ্য এখন অনেক পরিণত—তিনি জানেন অন্নপূর্ণাই পারেন তাঁকে শিবরোষ থেকে বাঁচাতে। তাই অন্নদাকে সন্তুষ্ট রাখতে উচ্চারণ করেন ·

অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥

শক্তিমানের তোষামোদ করাই তখন যুগধর্ম। ভারতচন্দ্র সুকৌশলে ব্যাসের জবানীতে বাস্তবটিকে তুলে ধরলেন। এরপর ব্যাসদেবের একান্ত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিটিও বেশ অভিনব :

পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥
পড়িনু পড়ানু যত মিথা সে সকল।

সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥

অষ্টাদশ পুরাণ রচয়িতার এই আত্মবিদ্রুপ কি পরোক্ষে দেবীর প্রতি কটাক্ষ নয়! ভারতচন্দ্র এখানে পরোক্ষে ব্যাসদেবের জয়-ই সূচিত করেছেন—দেবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে মানুষের জয়। তোষামোদ-প্রিয় দেবী শেষ পর্যন্ত শিবকে শান্ত করে ব্যাসদেবকে বর দিলেন :

অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥

কাশী থেকে বিতাড়িত হওয়ার বিষয়টি ব্যাস মেনে নিতে পারেন নি—কারণ 'তেজোবধ হয় যার : প্রাণবধ ভাল তার : কোনখানে সমাদর নাই।' তাই ব্যাসদেব 'দ্বিতীয় বারাণসী' নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। এ-বিষয়ে গঙ্গার সহায়তা তিনি আশা করেছিলেন, কারণ গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রচারে তিনি ছিলেন সহায়ক। কিন্তু গঙ্গা তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। ব্রহ্মাও জানালেন যে তাঁর প্রস্তাব অবাস্তব। ব্যাস কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করতে চান—তাঁর সাধনমন্ত্র :

যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন॥

এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি শেষ ভরসা অন্নদার তপস্যায় রত হলেন। কারণ :

শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা॥
তদাবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়॥

কিন্তু অন্নদা তো শিব-গৃহিণী। 'দ্বিতীয় কাশী' নির্মাণে ব্যাসদেবের সহায়তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, অথচ ব্যাসের তপস্যাকে তিনি অস্বীকার করতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত ইতিকর্তব্য স্থির করে নিলেন—ব্যাসকে 'শাপ দিব বর দিয়া'; অতএব অন্নদার জরতী বেশ ধারণ এবং ছলনার সাহায্যে ব্যাসদেবকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন 'গর্দভ হইবে বুড়ি এখানে যে মরে'। ব্যাস দ্বিতীয় কাশী গড়তে চেয়েছিলেন এই আশা নিয়ে যে, এখানে মরলে সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষলাভ হবে—সে আশা আর পূরণ হল না। এরপর ব্যাসদেবের উদ্দেশে দৈববাণী হল :

ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

আপাতভাবে দেখলে পরাজয়ই হয়েছে ব্যাসের। কিন্তু জরতী বেশে অন্নদার আসল পরিচয় জানার পর ব্যাসের অভিমানক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা :

শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥
ব্যাসবারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্যদোষে হইল গর্দ্দভ বারাণসী॥

এই পরিণতির কাকে দায়ী করবেন ব্যাস? সম্ভবত কাউকেই দায়ী করেন নি—কারণ ব্যাস তো জেনে গেছেন কারোর ওপর আস্থা রাখার সময় তখন নয়—অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের সেই কালে মানুষ দেববাদ সম্পর্কে যে তীব্র সংশয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল

তারই প্রতিফলন ঘটেছে ব্যাসের চরিত্রে। মানুষের মর্যাদা নিয়ে তিনি দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চেয়েছিলেন—পারেননি, কারণ এই দেবতারা তো সমাজের সেই অংশের প্রতীক যারা মানুষকে মর্যাদা দেয় না। যারা সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রেখে নিজেদের প্রতিপত্তি কায়েম করতে চায়। পুরাণের শর্ত মেনে ভারতচন্দ্র ব্যাসদেবেকে 'দৈবাহত পুরুষ' করেছেন। কিন্তু কবির মনোগত অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম—তাই তিনি ব্যাসদেবকে উপলক্ষ করে দেবমহিমার নগ্ন রূপটিকে প্রকাশ করে দিয়েছেন—সব ছাপিয়ে তাই সমগ্র ব্যাসপর্বে ব্যাসদেবের এই প্রতিবাদী প্রশ্নই শেষ পর্যন্ত রণিত হতে থাকে: 'কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া?' ব্যাসদেব আগাগোড়া আত্মসচেতন, আত্মসম্মানযুক্ত জ্ঞানী মানুষ হয়ে থাকতে চেয়েছেন—বস্তুত মধ্যযুগীয় গোঁড়ামীর উর্ধ্বে তিনি নিজেকে নিয়ে যেতে পেরেছেন। তাই তিনি হরি থেকে হরে এবং শেষে অন্নদায় যেতে পেরেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাস্তবচেতনাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি বুঝেছেন যে ক্ষমতাবানের ভজনা করারই যুগ সেটা। তবে ব্যাসের মাধ্যমে ভারতচন্দ্র যেটা বলতে চেয়েছিলেন সেটি বিদ্যাসুন্দর পালার একটি বিষ্ণুপদে উচ্চারিত হয়েছে :

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে।

এটাই তো ছিল ব্যাসদেবের লড়াই।

অপ্রধান চরিত্র

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডের প্রধান তিনটি চরিত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। অপ্রধান হলেও তিনটি চরিত্র—সতীর মা প্রসূতি, উমার মা মেনকা এবং সতীর পিতা দক্ষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু/চার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

॥ প্রসূতি ও মেনকা॥

পুরাণ অনুযায়ী প্রসূতি-কন্যা সতী বিনা আমন্ত্রণে পিতৃগৃহে উপস্থিত হন পিতা দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে, কিন্তু সেখানে পিতা কর্তৃক শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞস্থলেই মত্যু বরণ করেন। পরের জন্মে সতী-ই হিমালয়-মেনকার সন্তান উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিবের সঙ্গে বিবাহ হয়।

সতীর পিতৃগৃহে আসা কবির বর্ণনায় বিবাহিত বাঙালি-কন্যার পিতৃগৃহে আসার সঙ্গে ই তুলনীয়। প্রসূতিকেও বাঙালি মায়ের আদলে গড়েছেন কবি—অনেকদিন অদর্শনের পর যে মা কন্যাকে দেখে আবেগে উদ্‌বেল হয়ে যান। সতী পিতৃগৃহে এসেছেন কৃষ্ণবর্ণা হয়ে, প্রসূতি আগের রাত্রে সতীর এই মূর্তি স্বপ্নে দেখেছেন—আর দেখেছেন ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে তার আভাস। তাই প্রসূতির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে উৎকণ্ঠা আবার সস্নেহ ব্যাকুলতাও :

আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছে।
ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছে॥

প্রসূতি সতীর দেবস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন—কিন্তু তবুও এক বাঙালি মায়ের মতোই প্রসূতি বলেছেন :

জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়।
জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥